—কালীশ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি পরিষদ
কলিকাতা

প্রকাশক—
সংস্কৃতি পরিষদ
৭, মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

মূল্য—সাত আনা—

১ম সংস্করণ, ১৩৪৮

—প্রিণ্টার—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
অজন্তা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৭নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

যাদের জন্য লেখা—

তাদেরই হাতে।

— কঃ মঃ —

আগমনী ১৩৪৬ সাল

কলিকতা।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বঙ্গবাসী)

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য (স্কটিশ)

শ্রীযুত বিবেকানন্দ মুখার্জি (যুগান্তর)

শ্রীযুক্ত রমেশ চক্রবর্ত্তী (চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি লিঃ)

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

শ্রীযুত সজনীমোহন মুখার্জি (জমিদার)

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা করপোরেশন)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)

নানাদিক দিয়ে এঁদের কাছে ঋণী, তাই জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আর কল্পনার জন্য বিশেষ করে ধন্যবাদ দিচ্ছি সুরেনদা (সংহতি সম্পাদক), বাসু ভট্টাচার্য্য, বন্ধুবর প্রদ্যোত মিত্র ও ডাঃ বিমল বসুকে।

কঃ মঃ

—এক—

হিমালয়ের ওপরে কৈলাশের কাছাকাছি ছিল এক বিরাট রাজ্য। যেমনি পেয়ারী বা ঐ রকম আরও অনেকে দূর দূর দেশ থেকে এসেছে হিমালয়ে আরোহণ করতে, এর বক্ষের বা মস্তকের নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কার ক'রে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার ইচ্ছায়, তেমনি কত সাদা কত কালা আদমী ও দেবতা যে এই রাজ্যটীর পরিধি মাপতে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ সফলকাম কিন্তু কেউ এ পর্য্যন্ত হ'তে পারেনি।

মহাদেবের অজান্তে কৈলাশ থেকে অনেক সময় অনেক তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ—নন্দী, ভৃঙ্গী দল বল সমেত এসে এ রাজ্যের 'পর অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু, কেউ কোনদিন এর কিছুই করতে পারেনি।

তক্ষকের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। কি বিষধর সাপ! সে একবার মনে করলো এ রাজ্যের যে কোন একটু ক্ষতি ক'রে নাগ সমাজে বাহাদুরী নেবে! সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে নানা বহুরূপী সাজে সেজে—জানত, তক্ষক নাগ সমাজের ভেতর একজন খুব নাম-করা বহুরূপী।

নাগ সমাজে যখনই কোন উৎসব হয়, তক্ষকের আর তখন নিঃশ্বাস ছাড়বার অবসরটুকুও থাকে না। অনেক সময় দেব-দেবতাদের উৎসবেও বহুরূপ দেখাবার জন্য ওর ডাক এসে থাকে।

কত যে মেডেল, কত যে সার্টিফিকেট ওর আছে! নাগ পর্ব্বতের বড় বড় তিনটী গুহা কেবল ভরতি।

সেই তক্ষক চল্‌লো ত' ভাবরাজ্যের পানে। যেই গেছে অমনি পাথরে পরিণত হ'য়ে গেল। নাগ সমাজে হাহাকারের রোল উঠলো। তক্ষক ছাড়া তারা যে বলহীন। সব নিরুপায় হ'য়ে যেয়ে ধ'রে পড়লো বাসুকীকে। বেচারা বুড়ো নিরীহ প্রাণী। সেই নানান্ ধর-পাকড় ক'রে নানা সর্ত্ত দিয়ে ভাবরাজ্যের অধিবাসীদের কাছ থেকে তক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

এ রাজ্যটী হিমালয়ের চেয়ে বিরাট, সমুদ্রের চেয়ে গভীর, শূন্যের মত সীমাহীন। যে কেউ ইচ্ছা করলে এ রাজ্যে ঢুকতে পায় না— যে কেউ আবার ইচ্ছা করলেই এর ভেতর ঢুকতে পারে, ভাব বোঝা দায়! তাই সকলে নাম রেখেছে ভাবরাজ্য।

অতবড় রাজ্য অথচ মালিক ছিল এক রাজকন্যা। রাজা কবে ম'রে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজকন্যা, নাম তার কল্পনা, সেই ছিল রাজ্যের একছত্র অধিশ্বরী। বিয়ে সে করেনি, বিয়ে তার ভাল লাগেনা। তার ছিল বসন্তের মত চির যৌবন। দূর থেকে পাহাড়ে, নদীর ডাক শোনা যেত, কল্পনার মন ঘরে টিঁকতো না। ছুটে যেত নদীর খাদের কাছে। উঁচু থেকে জল গড়িয়ে পড়তো পাহাড়ের গা বেয়ে, কল্পনা লাফিয়ে পড়তো ঐ জলে। স্রোতের সাথে সাথে, দেবতার পা থেকে ঝরা ফুলের মত ভাসতে ভাসতে চলে যেত। যতদূর তার মন যায়—এতে তার প্রাণে ভয়ের লেশমাত্রও যেমনি ছিলনা, তেমনি জাগত না মোটেই কোন আতঙ্ক।

সারাদিন ঝ'রে পড়তো ঝরণার জল—হরিণ-শিশু এসে তাতে গা ভিজিয়ে যেত। কল্পনা দণ্ডের পর দণ্ড তাদের গলা জড়িয়ে ভিজতে থাকতো ঐ ঝরণার জলে। হরিণ-শিশুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সে খেলা করে। কোন স্থানে স্থির নেই—ঠিক তোমাদের

মর্ত। ক্লাসে হয়ত মাষ্টার মশায় পড়িয়ে যাচ্ছেন—তোমাদের মনটা হয় ঠাকুরমার ঝুলি—নয়ত রান্নাঘরের দুধের কড়াইর ভিতর। কড়িখেলা—ক্যারামবোর্ড—ঘুড়ি উড়ানো বা ঐ রকম অনেক কিছুতেই ব্যস্ত থাকে।

কল্পনাও ঠিক তোমাদের মত। একবার এটা ভাবে—আবার ওটা ভাবে। কি যে করবে না-করবে কিছুই ভেবে পায়না। কিছুতেই নেই তার মতের স্থির। বিদ্যুতের মত সে চঞ্চল, মনের চেয়েও সে বেগবতী। প্রভাতের চেয়েও সে সুন্দর—সন্ধ্যার চেয়েও সে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নের চেয়েও তেজস্বিনী।

রাজ্যে ধন-দৌলতের অভাব যেমনি নেই, তেমনি অভাব নেই লোক-জন আর প্রাকৃতিক সম্পদের। গাছভরা সব সময় ফল থাকতো। যা'র যখন ইচ্ছা খাও। বাধা দেবার কেউ নেই। যত খাবে তার দ্বিগুণ ফলে থাকবে। ময়রার দোকানে যাও, দোকান ভরা ভারে ভারে সাজান মিষ্টি দ্রব্য। মনের সাধ মিটিয়ে তুমি খাওনা কেন—ময়রা বা তার বউ কেউ তোমাকে কিছু বলবে না—এমনকি পয়সাও তোমার দিতে হবে না।

তোমাদের যা লোভ হচ্ছে আমি তা বেশ টের পাচ্ছি। আমার কাছে মিথ্যে কথা বললে কি হবে? আচ্ছা দাও মাটিতে একটা ফুঁ—দেখো কেমন 'লালা' পড়ে। আমি সব জানি। তোমাদের মত ছোট্ট ভাই-বোনদের খুব ভালবাসি কিনা, তাই! তোমাদের মনের সব কথা আমি বলতে পারি। আর আমি যে তোমাদের মতনই একদিন ছিলুম। ঠাকুরমার 'ভাড়' থেকে গুড় চুরি ক'রে খেতাম। কাকাদের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে হেনা, মেনা, ডিপু, আশি, সুধা সকলকে নিয়ে চানাচুর কিনে খেতাম।

গাছে উঠে পাড়ার বিন্দু পিসির আম, কুল এক মুহূর্তে ছিঁড়ে 'কোরচ' ভর্ত্তি করে ফেলতাম। বিন্দু পিসি টের পেয়ে লাঠি নিয়ে

তেড়ে আসতো। সেকি লাঠি! আমি বিন্দু পিসিকে কথায় কথায় ভুলিয়ে নেমে পড়ে ছুট দিতুম। আর আমার নাগাল কে পায়! তারপর আমিওত' কম নাছোড়বান্দা নই! দূরে যেয়ে বিন্দু পিসিকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওগুলো খাওয়া ধরতুম। বিন্দু পিসি ফোঁস ফোঁস ক'রে ফোঁস মনসার মত রাগে ফুলতে থাকতো। গলায় জল নিয়ে তোমরা অনেকে যেমন গড় গড় শব্দ করতে থাকো, রাগে তেমনি গড় গড় করতে করতে ঘরে ফিরে যেত। আমি খিল খিল করে হাসতে হাসতে মনের আনন্দে ওগুলোর সদ্ব্যবহার করতে থাকতুম।

—দুই—

পূর্ব্বেই বলেছি, নানা দেশ থেকে নানা লোক আসত ভাবরাজ্য দেখতে। যেমনি ভারতবর্ষ সোনার দেশ ব'লে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কাছে ছিল পরিচিত। তারা মনে করতো—এর মাটিতে ফলে সোণা, নদীতে জলের পরিবর্ত্তে বয় দুধ আর মধু। তেমনি এই ভাবরাজ্য ছিল সকলের কাছে একটি পরম আশ্চর্য্য দেশ।

সবাই আকুলি বিকুলি করতো—রাজ্য জয় ক'রে রাজকন্যা কল্পনাকে বিয়ে ক'রে দিব্বি নিজেদের দেশের গৌরব বাড়াবে। কিন্তু ভাবরাজ্যটি এমনি সুরক্ষিত ছিল যে, কোন বাহিরের শত্রুর সাধ্য ছিল না—এর ভিতরে প্রবেশ করে। আজকাল তোমরা জার্ম্মেণীর সিগফ্রিড্ লাইনের বা ফ্রান্সের 'ম্যাজিনয়ট' লাইনের নাম জান না এমন খুব কম। জার্ম্মেণী ও ফ্রান্সের সীমানা এই লাইন দ্বারা বেষ্টিত, যাতে সীমান্তে কেউ কারোর অপকার করতে না পারে। কংক্রিট—বিলেতী মাটী—পাথর লোহা আরও কত কি দিয়ে পাহাড়ের মত এগুলো গাঁথা। এর বিষয়ে বেশী বলে আর তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাইনে। জার্ম্মেণী আর ফ্রান্সের সিগফ্রিড্ ম্যাজিনয়ট লাইনের চেয়েও দৃঢ় সুরক্ষিত ভাবরাজ্যের চতুর্দ্দিক।

বিনা অস্ত্রে তোমরাও হয়ত গুট গুট ক'রে ঢুকে যেতে পারো—আবার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে—ষ্টালিন তার লাল ফৌজ নিয়ে—হিটলার তার কামান হাঁকিয়েও হয়ত এগোতে পারবে না। ভাবরাজ্যের আর একটী বিশেষত্ব ছিল, এর অধিবাসীরা প্রত্যেক লোকের মনের ভাব টের পেত। কত বিদেশী কু-অভিসন্ধি নিয়ে ভাবরাজ্যে গিয়ে যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে আবার খুব

প্রতিপত্তিও লাভ করেছে অবশ্য সু অভিসন্ধি নিয়ে। কিন্তু রাজকন্যা কল্পনার মন কেউ অধিকার করতে পারেনি বা ভাবরাজ্যও কেউ করতলগত করতে পারেনি।

সেবার—। সেবার বলতে তোমরা কেউ যেন দু'চার বছর মনে কর না। বেশ কয়েক যুগ হ'য়ে গেছে—আমাদের বাংলা থেকে অলোক নামে এক ছেলে যাত্রা করলো ভাবরাজ্যের দিকে। অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল এই অলোক ছেলেটী। তার কথা যদি তোমরা শোন, গায়ের লোম কাটা দিয়ে উঠবে। ছিপ ছিপে চেহারা, বাতাসের গায়ে ঢলে পড়ে—অথচ তার বীরত্বের কাছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই দেশেরই বীরদের গরিমা ম্লান হ'য়ে যায়।

অলোক নামটী শুনেই যেন কেমন শান্ত মনে হয়! তারপর অতটুকু ছেলে—তার ভিতরে যে এমন গুণ লুকোন ছিল, এ শুনলে তোমরা যেমন আশ্চর্য্য হ'য়ে যাও, তেমনি আমিও। অলোকের কয়েকটী বিশেষত্ব ছিল—তার মন ভরা ছিল সরলতা, মুখভরা হাসি। তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে যেমনি ভাল গল্প বলতে পারতো তেমনি গল্প লিখতেও জানত। আমি ত কোন ছার! তোমরা শরৎ চাটুজ্জ্যের নাম শুনেছত? এই সেবার যিনি মারা গেলেন—কি রবি ঠাকুর; এঁরাও ছোটবেলায় অলোকের গল্প শুনবার জন্য ভিড় করতে।

ও—হা! অলোকের সম্বলের ভিতর আর কি ছিল জান? মায়ের আশীষ। কোন্ মা বলত? যে মায়ের গর্ভে আমরা জন্মেছি, সে মা ছাড়া আমাদের যে আর একটি মা আছে জান? তিনি হচ্ছেন মায়ের মা। আমি—তুমি—তোমরা—তোমাদের বাবা মা—সবই এই মায়ের ছেলে মেয়ে। গলা শুকিয়ে গেলে মার বক্ষের দুধ পান ক'রে নিজের তৃষ্ণা দূর করি। যাঁর বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ ক'রে আমরা পরিপুষ্ট, যাঁর গোলা ভরা খাদ্য খেয়ে আমরা ক্ষুধা

দূর করি—সেই মা। এই সুজলা সুফলা বাংলা মা অলোককে ভাল বাসত।

আর বাসবেই বা না কেন! সে ছিল মায়ের সুযোগ্য সন্তান। মায়ের দুঃখ কষ্টে তার মন কেঁদে উঠেছিল। একটা কথা তোমরা জাননা হয় ত—মা বিদেশীদের হাতে বন্দিনী। তার পা শৃঙ্খলিত। সুযোগ্য পুত্র অলোকের প্রাণ তাতে কেঁদে উঠতো। মাও যখনই পেত তাকে, বলতো 'অলোক আমিত পারি না আর পরাধীনতার শৃঙ্খল বইতে, তোরা এত ছেলে থাকতে আমার এই লাঞ্ছনা!"

নিরুপায় অলোক। সেই বা একা একা কি করবে! দুচোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে পড়তো। তারপর মনে করলো ভাবরাজ্য জয় ক'রে রাজকন্যা কল্পনাকে যদি বিয়ে করতে পারে—তা'হলে হয়ত মায়ের দুঃখ-কষ্ট দূর করা তার পক্ষে সহজ হবে।

কল্পনা ভাবরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। শক্তি তার অসাধারণ। এক মুহূর্ত্তে, ইচ্ছা করলে, রাজাকে পথের কাঙ্গাল ক'রে দিল—আবার পর-মুহূর্ত্তে 'ফুটপাথ' দিয়ে যে ভিখিরীটা যায়—তাকে ডেকে এনে রাজা ক'রে দিল। তোমাদের ভিতর কেউ হয়ত দু'তিন বছর পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে না—যদি যেয়ে কল্পনার আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াও—সে কি করবে জান? তুমি দেখবে তার জন্য সব বিষয়েই পুরো নম্বর পেয়ে গেছে। এমনি অসাধারণ কল্পনার ক্ষমতা!

অলোক বইতে পড়তো, নানা লোকে গল্প করতো। ওর মন ছট্‌ফট ক'রে উঠতো! ওর মন কেঁদে উঠতো— কখন কবে রাজকন্যা কল্পনাকে জয় ক'রে নিয়ে আসবে। ওর মায়ের অভাব দূর করবে।

লোকে বলে যা করবার জন্য বা পাবার জন্য মনের একাগ্রতা বেড়ে যায়—তা কখনও অপূর্ণ থাকে না। শত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও চলার পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে কোন কষ্ট হয় না।

—তিন—

শুভলগ্নে অলোক রওনা হ'লো, কারোর মানা সে শুনলো না—কারোর বাধা সে গ্রাহ্য করলো না! কত বাধা—কত বিঘ্ন তার চলার পথে আসতে লাগলো।

কখনও সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা প্রলয় নাচন নেচে ধ্বংসের তালে তালে ছুটে চলেছে। অসংখ্য তাতে জলীয় হিংস্র জন্তু। কুমীর, হাঙ্গর, তিমি, সিন্ধুঘোটক, প্রাণঘাতী জীব আরও কত কি! আমাদের ক'লকাতা বা বিলাতের কোন চিড়িয়াখানায়ও সমস্ত জানোয়ার ধরে রাখতে পারা যায়নি। এমনি বিকট বিকট জন্তু ঢেউয়ের সাথে সাথে ভেসে উঠছে। আর অলোক!—বাঙ্গালী যুবক অলোক, তোমাদের চেয়ে নয় কিছুটা বড়ই হবে, সে চলেছে সাঁতার কেটে ওরই ভিতর দিয়ে।

ওরে বাবা! কি সর্ব্বনাশ! অলোক সেই সমুদ্রের মাঝামাঝি দেখে কি—বিরাট এক জন্তু। তার মুখের হা-টা হবে অন্ততঃ বিশ হাত। দূর থেকে আসছে আর সমুদ্রের জলরাশি একবারে ওলটি পালটি খাচ্ছে। অন্যান্য জীবজন্তু যে যেখানে পাচ্ছে ছুট দিচ্ছে। এবার আর অলোকের রক্ষে নেই। ওকেই লক্ষ্য ক'রে ঐ বিকট জন্তুটী এগিয়ে আসছে। অলোক ত ছুটে চলেছে। নেই তার মনে ভয়, নেই তার প্রাণের মায়া। এমনি ও হতচ্ছাড়া।

কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! পর পর তিন তিনটে তিমি চলেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে। তাদেরও অলোকের মত কোন খেয়ালই ছিল না। আর তিমি ভয়ানক অহঙ্কারী! মনে করে তার মত জীব বুঝি আর জল-জগতে নেই। 'মুই কি হনুরে' কিন্তু ভগবানের

এমনি বিচার! এক সঙ্গে তিনটী যেয়েই ঢুকে গেছে ঐ মারাত্মক বিশ্বগ্রাসী মুখগহ্বরে। আর কোথা যাবে! তিন তিনটী তিমি এক গ্রাসে খেয়ে হজম করাও ত কম কথা নয়! তিনটে একসঙ্গে পেটের ভিতর যেয়ে আরম্ভ করলো ধস্তাধ্বস্তি। ওদিকে ও প্রাণীর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

শত বলবানই হউক না কেন—তিনটী তিমির চোট্ সহ্য করা বড় সোজা কথা নয়। পেট চিড়ে ওগুলো কিছুক্ষণ বাদে বেরোল। জীবন্ত অবশ্য কোনটাই রইল না। চারটেই ভুঁইচালের মত পড়ে রইল। অলোক কিন্তু ততক্ষণ পারে উঠে গেছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! যখন ও পারে যেয়ে দাঁড়াল—যেন একফোঁটা জলও ওর গায়ে লাগেনি। ও যে জল থেকে উঠেছে তোমরা যদি দেখতে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতে না। অথচ ঐ সমুদ্রটী পার হ'তে আমাদের হিসেব মত লেগেছিল পনর দিন।

ও ঐ যে চারটী প্রাণী মারা গেল, ওদের মাংস থেকে একটী দ্বীপ হ'য়ে বসলো। আজও ঐ সব সমুদ্রে সে দ্বীপের সঙ্গে ঘা খেয়ে অনেক জাহাজ ডুবে যাবার খবর আমরা শুনে থাকি। সমুদ্রের নাম হচ্ছে তাণ্ডবা। দ্বীপের নাম নাবিকেরা রেখেছে চতুর্কোণী। কারণ ওর নাকি চারটে কোণ আছে। তার যে কোন একটায়ে ঘা লাগলে জাহাজের কোন অস্তিত্ব থাকে না।

কত পর্ব্বত! কত নদী মরুভূমি—আরও কত কি-র ভিতর দিয়ে যে অলোক ছুটে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সাহারার মরুভূমির নাম তোমরা শুনেছ, তার চেয়েও ভীষণ—অলোকের সে সব মরু-ভূমির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। তার ওপর পা দিয়েছ অমনি পুড়ে ফোসকা পড়ে যাবে। অলোক কিভাবে পার হ'তো ঐ সব মরুভূমি জান?

একবার অলোকের ঠাকুর মা গিয়েছিলেন কামরূপ কামাখ্যায়

তীর্থ করতে। সেখান থেকে নানান মন্ত্র-তন্ত্র তিনি শিখে আসেন। তার মধ্যে একটী মন্ত্র ছিল—ধর তোমাদের ভিতর কেউ কলকাতা থেকে সিমলা বা আর কোথাও যাবে। একটী গাছের 'পর চড়ে মন্ত্র প'ড়ে গাছকে বললে—"হে বৃক্ষ-দেবতা আমাকে তুমি ইপ্সিত স্থানে নিয়ে চল।" অমনি বৃক্ষ দেবতা চড় চড় ক'রে গাছটাকে উঠিয়ে নিয়ে—ভোঁ—ভোঁ ক'রে ছুটতে থাকবে! পৌছে দেবে তোমায় তোমার গন্তব্য স্থানে। অলোকও মরুভূমিগুলো এভাবে পার হ'য়ে যেত। তবে জলপথে এভাবে যাওয়া অনেক সময় বিপদ-জনক ছিল।

মরুভূমির পর মরুভূমি। সমুদ্রের পর সমুদ্র ত অলোক পার হ'য়ে গেল। সামনে বিশাল অরণ্য। নেই কোন এর সীমা—নেই কোন ফাঁকা। অলোকের ত চক্ষু স্থির! এত আর তেমনি ছেলে নয়। ছুটে চলতে লাগল বনের ভিতর দিয়ে। সেকি বন! আমাদের সুন্দর বনের চেয়েও ভীষণ। আফ্রিকার জঙ্গলের কথা তোমরা ভূগোলে পড়ে থাক। নানা পর্য্যটকদের লেখা পড়। সিনেমায় অবশ্য যারা যাও—পর্দ্দায় দেখেও কতকটা ধারণা ক'রে নিতে পারো। এ বন কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ! বাঘ, ভল্লুক, গণ্ডার, হাতি, এক একটির কি সে ভীষণ গর্জ্জন! অলোক কিন্তু ছুটে চলেছে। নেই তার কোন ভ্রুক্ষেপ। মনে তার অফুরন্ত উৎসাহ—কপোলে তার সাহসের দীপ্তি। বনের জমাট বাধা অন্ধকারও যেন দূর হ'য়ে গেছে।

ওঃ—কে! কি ভয়ানক এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার ক'রে আছে গাছের ভিতর দিয়ে। লক্ লক্ কচ্ছে অগ্নির মত তার জিহ্বা। আমরা হ'লে সেখানেই মূর্চ্ছা যেতাম। ধন্য অলোক। মাঝে মাঝে তোমাদের অলোকের এ সাহসের কথা শুনে নিশ্চয়ই মনে সন্দেহ জাগছে—সত্যি অলোক বাঙ্গালী কিনা! কিন্তু কেন

বাঙ্গালী কি বীর নয়? প্রতাপাদিত্যের কথা তোমরা পড়নি? ইশা খাঁর কামানের গর্জ্জনে আকবরের মত মোগল সম্রাট—তার সেনাপতি মানসিংহকেও পিছু হটে যেতে হয়েছিল। সিরাজ যখন তার রাধারমণ ঠাকুরের পূজা ক'রে বেরোত অশ্ব নিয়ে যুদ্ধ করতে, কার বাপের সাধ্য ছিল সিরাজকে বাধা দেয়? মোহনলাল সামান্ত এক ব্রাহ্মণের ছেলে, যুদ্ধবিদ্যা কোনদিন শেখেওনি। তাকে নিল বরণ ক'রে সিরাজ তার সেনাপতির পদে! কাতারে কাতারে মারাঠা সৈন্ত নিমেষে মোহনলাল শেষ ক'রে যেতে লাগলো। ভাস্কর পণ্ডিতের মত বীর কি নাকালটাই না হ'লো! এখনকার বাংলা আর অতীতের বাংলা দুইকে এক পর্য্যায়ভুক্ত ক'রে নিওনা! তাহ'লে এর পর ঘোর অবিচার করা হবে।

অলোক বাংলা মায়ের নাম ক'রে মাটীতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলো। বিষাক্ত সর্প প্রথমে কিছুই টের পায়নি যে, তার শিকার পালিয়ে যাবে। সে ত ওৎ পেতেই আছে। এদিকে যেই অলোক এড়িয়ে গেছে, অমনি ওর নজর পড়েছে দূরে। আর কি রক্ষা আছে?

শোঁ-শোঁ করে ছুটতে লাগলো অলোকের দিকে। সারা বন কেঁপে উঠলো সাপের ফোঁস ফোঁসানিতে। হিংস্র জন্তু যে যেখানে পারলো ছুট দিল। আমাদের এখানে যদি ওই শব্দ হ'তো ঘরগুলো কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেত। নিরুপায় অলোক। কি করবে ভেবে পায় না। সাপটা ওকে ধরে ধরে, ও ত প্রথমটায় একে বেঁকে দৌড়তে লাগলো। অবশ্য একে বেঁকে দৌড়লে সাপ ততটা ধরতে পারে না, কিন্তু ঐ নিবিড় বনে তাও যে পোড়া ছাই সম্ভবপর নয়। এক বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আবার নূতন বিপদে জড়িয়ে পড়বার যে প্রতি পদে সম্ভাবনা রয়েছে।

যতটা পারলো একে বেঁকে চলতে লাগলো, তাতেও দেখে যে, সাপটা ওর পেছনে পেছনে আছেই! এবার আর ওর রক্ষা নেই! একদম শত্রুর নাগালের ভিতর অলোক। ফণা বিস্তার করে সাপ ত ছোবল মারতে উঠেছে। কি রকম ওর মনের অবস্থা তখন তোমরা নিজেরাই একবার চিন্তা করে দেখ।

মায়ের নাম স্মরণ করে অলোক উপরে চেয়ে দেখে একটি লতা ঝুলছে। কি হবে না হবে, কি করা উচিত না উচিত, সে চিন্তা করবার মত সময়ও যেমনি ছিল না, তেমনি ছিল না কোন বুদ্ধির স্থিরতা। খপ্ করে লতাটাকে ধরে ঝুলতে লাগলো। এ দিকে হ'য়েছে কি—সাপটা ধারণাও করতে পারেনি এরকম কিছু কাণ্ড ঘটে বসবে। অনেক দূর চলতে চলতে ও হ'য়ে পড়েছে ক্লান্ত; এবার সে এর শোধ নেবে। যেই ছোবল মারবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অমনি এই অভাবনীয় কাণ্ডটি ঘটে গেল।

খপ্ করে লতাটাকে ধরে ঝুলতে লাগল

বেশী রাগ হ'লে 'বোধ ভাস্তি' কিছু থাকে না! দেখ না মাষ্টার মশায়রা তোমাদের প্রহার করেন,—কখন? যখন রাগে তাঁরা নিজেদের সাধারণ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন। সাপটারও ..

সেই দশা। রাগে ও ওর দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। শিকার যে সামনে নেই তা আর ও বুঝতে পারেনি। যত শক্তি ছিল তা দিয়ে মারলো 'ছোবল' গিয়ে পড়লো মাটিতে। তোমরা যদি তা দেখতে মা-মা বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে। হয়ত ভয়ে লতা ছিঁড়ে ধড়মড় করে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেতে মাটিতে। অলোক কিন্তু ভয় মোটেই পায়নি।

জীবন মৃত্যুর যেখানে সন্ধিস্থল, সেখানে ভয় মোটেই আসতে পারে না। শুধু অলোক বলেই নয়, প্রত্যেকের বেলায়ই এ কথা প্রযোজ্য। সাপ্‌টা ছোবল মারার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারায়। অলোক নেমে আস্তে আস্তে অন্য পথ ধরে চলতে থাকে।

—চার—

ভাবরাজ্যের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে যদি একবার রাজকন্যা কল্পনার কাছে যাওয়া যায়, তবে আর কোন বিপদ থাকে না। কিন্তু মুস্কিল। অলোক জানে না ত কি করে প্রহরীদের ফাঁকি দিতে হয়। দূরে ধূ ধূ করে ঐ একটা রাজ্য, গগনস্পর্শী তার প্রাসাদের চূড়া, হয়ত বা ভাবরাজ্যই হবে! এত কষ্ট করে এত দূরে এসে যদি ফিরে যায় তাহ'লে কি ক'রে লোকসমাজে ও মুখ দেখাবে।

তোমরা হয়ত মনে করতে পার, কেন এত আব পরীক্ষায় ফেল করা নয় যে, বাবা কাণ মলবে, মা আদর করে দুধের সর খেতে দেবে না কিংবা পাড়ার দশজনে ফেলকরা ছেলে বলে টিটকিরী দেবে। সে ত নিজে ইচ্ছা করেই গিয়েছে। পারলো ভাল, না পারলো কি আর হবে? কিন্তু অলোক হ'লো এক-রোখা ছেলে। অকৃতকার্য্যতার শ্লেষ বা অপমান ও কোনদিন সইতে পারত না। তারপর এতদূর পথ এসে, আর প্রথম ওর মনেই ছিল না যে, প্রহরীদের ভোলাতে আবার কোন সাজ সরঞ্জামের বা মন্ত্র তন্ত্রের আবশ্যক হবে!

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পথ চল্‌তে চল্‌তে ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, শত হ'লেও মানুষ ত—রক্তমাংসের শরীর! কত অত্যাচার আর সহ্য হয়? ঝড় নেই, বাদল নেই, রোদ নেই, কিছু বাদ নেই। ও চলেছে পথ বেয়ে। খাবার যা সঙ্গে ছিল অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। বনের ফল মূল খেয়ে কোন দিন কাটায়, কোনদিন আবার তাও জোটে না।

শরীরও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়তে লাগল। ও যে কি করবে ভেবে পায় না। নিরুপায় হ'য়ে সামনে ছিল অশ্বত্থ গাছ, তারই নীচে নিল আশ্রয়।

দূরে দেখা যায় পুরী। সাত সাতটী ময়ূর পেখম ধরে আছে, এর চূড়ার পর হয়ত ঐ হবে ভাবরাজ্য। জল-পিপাসু আহত সৈনিকের মুখের কাছে জলের পাত্র ধরে যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তখন তার যা অবস্থা আমাদের অলোকেরও ঠিক সেই দশা। গাছের গুড়িতে মাথা দিয়ে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লো হতাশ মুমূর্ষের মত। বাংলা মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে মনে জেগে উঠলো তার মায়ের গোলাভরা ধান, ক্ষেত, ভরা শস্য, গাছভরা ফল, কত কি খাদ্য দ্রব্য থাকতে আজ বহুদূরে এসে খাদ্যাভাবে হয়ত না খেয়েই মারা যাবে। ওর মনে স্পষ্ট করে জেগে উঠলো বাংলার নদীর কথা। এক বিন্দু জলের অভাবে পিপাসায় ও মরতে বসেছে আর বাংলার নদী বাংলার বুকের পর দিয়ে কুল কুল সুরে নেচে চলেছে। বিচীমালার আনন্দ যেন আর ধরে না। পরস্পরের সঙ্গে কাণাকাণি করতে করতে উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে।

গুরু গম্ভীর গর্জ্জণে বিরাট দৈত্যের মত মেঘ বাংলার আকাশ ঢেকে ফেলে, অথচ এতে ভয় পাবার কিছু নেই। গলধবরে বর্ষণ হ'তে থাকে। সিক্ত করে দেয় গ্রীষ্মের চৌচীর হ'য়ে ফেটে থাকা বাংলার বুক। চাতক, চাতকী মনের আনন্দে বর্ষার জল পান ক'রে পরিতৃপ্তি হয়। ঠিক পর মুহুর্ত্তে সূর্য্য বাংলার আকাশে দীপ্তি পায়। রামধনুর বর্ণচ্ছটায় কৃষক বধূরও মনের অন্ধকার দূর হয়। গুন গুন করে সে গাজন, শিবের বিয়ের-গান গাইতে থাকে।

ছোট ছেলে মেয়ের দল, বৃষ্টি পড়ে রদ্দুর ওঠে, পাতি শেয়ালের

বিয়ে হয়। বলে গৃহ প্রাঙ্গনে লাফালাফি করে কুমীর কুমীর খেলতে খেলতে ভুলে যায় সত্যিই তারা কুমীর না মানুষ। বাংলা মায়ের কথা মনে হতেই চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়াতে লাগলো। ক্লান্তিতে চোখের পলকও পড়তে লাগলো ধীরে ধীরে। ঢুলু ঢুলু হ'য়ে এলো আঁখি ঘুমে। নিদ্রাদেবী কত আদর করে, সোহাগ ভরে টেনে নিল অলোককে তাঁর কোলে।

তোমাদের ভারি দুঃখ হচ্ছে না? এদিকে হ'য়েছে কি জান? ও যে শুধু মায়ের কথাই ভাবছে তা নয়। কল্পনার কথাও বেশ মনে উঁকি ঝুকি মারছিল। ঘুমের ভিতর স্বপ্ন দেখছে কে যেন ওর হাতে একটী জিনিষ দিয়ে গেল, অমনি, এক ছুটে কল্পনার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। চারিদিক থেকে সহস্র প্রহরী, অশ্বারোহী, পদাতিক আরও কত সৈনিক ওকে মারবার জন্য তেড়ে এসেছে। কল্পনাকে কিছুতেই তারা ওখান থেকে বাংলায় আসতে দেবে না। ওদের সঙ্গে আরও অনেক রাজ্য যোগ দিয়েছে। কল্পনা কিন্তু অলোককে খুবই ভালবাসে। অলোকের সঙ্গে সে আসবেই।

জলে ভরা বাংলার বুকের 'পরে ধানের শিশ্‌গুলো ঢেউ খেলে যায় মুকুল সুশোভিত আম্র পল্লবের গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। হাসনাহেনার গন্ধে আবহাওয়া করে তোকে মাতাল। রজনী-গন্ধা সোহাগ ভরে গায়ে ঢলে পড়ে, কল্পনা সব শোনে অলোকের কাছ থেকে। ও বংলায় না গিয়ে থাকতে পারবে না।

বেশ স্বপ্ন দেখছে অলোক। প্রকৃতি আবার ভয়ানক হিংসুটে। অলোকের ঘুমের ভিতরই মনে হ'লো শত্রু পক্ষ থেকে কে যেন ওর মাথায় এক লোহার গোলা ছুঁড়ে মারল। চীৎকার করে উঠ্‌লো অলোক। সারা বন বেদনায় গুম গুম করে গুমরে উঠলো অলোকের কষ্টে। ঘুম গেল ওর ভেঙ্গে। দেখে মাথার ধারে

একটী বট ফল পড়ে রয়েছে—তবু ভাল।

আর—আর! বিশ্বাস করতে পারে না অলোক। ও মনে করেছে, ওর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। হয়ত তাই দেখছে ঝাপসা। তাড়াতাড়ি চোখ দুটো নিল রগড়ে। ওর আনন্দ ধরে না! দূর হ'য়ে গেছে সব ক্লান্তি, মনের পুঞ্জীভূত ব্যথা। মুখে ফোটা হাসির ঝলকে ঝল্‌কে উঠেছে সারা বন। দূর হ'য়ে গেছে আশ পাশের ঘনায়িত অন্ধকার। অলোক চোখ মেলে চেয়ে দেখে সামনে মাতৃমূর্ত্তি।

"ভয় পেও না অলোক! আশ্চর্য্য হবার এতে কিছুই নেই। আমি যে তোমার মা, বাংলা। তোমার সাথে সাথে ছুটতে ছুটতে এসেছি। কোন ভয় নেই, হতাশ হ'য়ো না। পারবে তুমি কল্পনাকে জয় করতে। আমার আশীষে তুমি হবে অজয়, কিন্তু বৎস? —না, না, অলোক চিন্তা কর না। তুমি কল্পনাকে জয় করবে। বিজয় টীকা তোমার ভালে শোভা পাবে। আর তার প্রভায় চতুর্দ্দিক হ'য়ে উঠবে উজ্জ্বল। আমি তোমার মা, সে গরিমা থেকে বাদ যাবো না। তোমার গৌরবে, তোমার জয়ে, আমারই যে আনন্দ বেশী।"

অলোক লুটিয়ে পড়লো মায়ের পদতলে। মা হাত ধরে তাকে তুলে খেলেন গণ্ডদেশে চুম্বন। মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ তাতে মাখান। কত তৃপ্তি!

"এসো অলোক তোমায় আমি সাজিয়ে দি। তাহ'লে কোন বিপদ আপদ আসতে পারবে না তোমার জয়যাত্রার পথে। তুমি হবে চির বিজয়ী।"

পরণে শ্বেতবাস, গায়ে ঢোলা কামিজ। গলায় শুভ্র উত্তরীয়। কপোলে শ্বেত চন্দন। অলোক গড় হ'য়ে প্রণাম করে আবার নিল মায়ের আশীষ। উঠে দেখে কোথায় কিছুরই কোন চিহ্ন

নেই। সবই যেন স্বপ্ন! তারপর নতুন জীবন পেয়ে এগিয়ে চললো অলোক তার গন্তব্যের পানে। প্রাণভরা যেমনি সাহস, তেমনি অফুরন্ত বিশ্বাস। তোমাদের শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য লাগছে? কিন্তু বাস্তবিকই এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। তোমরা যদি এ ভাবে এরকম মায়ের সুসন্তান হও তোমাদের সুখ দুঃখ সব তিনি বুক পেতে নেবেন। তোমাদের সব রকম অত্যাচার ও আব্দার তিনি সহ্য করবেন। দেখ না আমরা যে মায়ের কোন কথা শুনি না, তবু আমাদের 'পর তাঁর কত দয়া! তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন।

মায়ের নাম করতে করতে অলোক আবার পথ চলতে আরম্ভ করলো।

—পাঁচ—

বিরাট অট্টালিকা। সুসজ্জিত প্রহরী দ্বারে দণ্ডায়মান। অলোক যেয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বললো, "নমস্কার দাড়োয়ানজী, বলতে পারো ভাবরাজ্য কতদূর ?"

দাড়োয়ান থমকে গেল। এমন মিষ্টি কথা কোনদিন সে শোনেনি। এমন পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক কোনদিন তার নজরে পড়েনি। স্বর্গের দেবদূতের কথা মাঝে মাঝে দাড়োয়ান শুনতো। তারা নাকি খুব সুন্দর। তবে কি দেবদূত ?

"আপনি কি স্বর্গ রাজ্য থেকে এসেছেন ?"

অলোক তেমনি আধ আধ স্বরে উত্তর দিল—"না আমি মর্ত্তের মানুষ, বাংলা মায়ের সন্তান। তাঁরই কোলে লালিত পালিত, স্বর্গ কি জানি না। আমি ভাবরাজ্যের রাজকন্যা কল্পনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বলতে পার ভাবরাজ্য কোথায় ?"

দাড়োয়ান কোন কথা না বলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে দিল। অলোক যা দেখলো—একসঙ্গে ঠিক বাংলারই মত রোদ আর বৃষ্টির খেলা। কোকিল গাইছে আর ময়ূর ধরেছে পেখম। সাপ আর ব্যাঙ পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে। অদ্ভুত আরও কত কি দেখলো অলোক। এক জায়গায় কতগুলি লতা, তাতে কি সুন্দর ফুল ! লিখে গেছে—ভাবরাজ্য।

চোখ নামিয়ে অলোক চাইল দাড়োয়ানের পানে।

"চিনতে পেরেছো ! এই ভাবরাজ্য। এটী রাজ্যের সদর দ্বার। তুমি এসো, তোমাকে আমি রাজকন্যার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দাড়োয়ান সঙ্গে একজন লোক দিয়ে তার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলে দিল। অলোকের হাতে দিল একটী ফুল। ওটা হচ্ছে ভাবরাজ্যের 'ব্যাজ' বা জাতীয় চিহ্ন। এক বোটায় দুটো ফুল। এক একটী ফুলে দ্বাদশটী পাপড়ী, এক একটী পাপড়ী আবার সাত সাতটী রঙে রঞ্জিত। ওতে আবার কোনটায় আঁকা মেয়ে ও পুরুষের ছবি। কোনটায় নদী, পাশে উদ্যান। নানা জাতীয় প্রাণী মনের আনন্দে তাতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আরও কত কি!

এই ফুলটী দেখলে সবাই মনে করবে অলোক এদের মিত্র। ফুলটী দেখতে এমনি সুন্দর, তা তোমাদের কাছে কি বলবো! আমি নিজের চোখে ত আর দেখিনি! তাই কি রকম করে তোমাদের বোঝাব! তবু লোকের কাছে যা শুনেছি তাতেই বলতে পারি তোমরা যদি ও ফুল দেখতে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠতে। ভাই বোনে যেমন খাবার জিনিষ নিয়ে, দাদা যদি কলেজ থেকে আসবার পথে টফি, বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে আসে, তা নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি করো, তার চেয়েও বেশী করতে ও ফুল দেখলে। টফি ত কোন ছাড়! বাগবাজারের রসগোল্লা, গরমের দিনে আইসক্রীম সরবৎ কিছুই তোমাদের মনে জাগত না, যদি ঐ ফুল একবার তোমরা দেখতে। যাক, যা পাওয়া যাবে না তা নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন? শুধু শুধু ভেবে মন খারাপ, সময় নষ্ট? আবার পড়া ঠিকমত না করলে মাষ্টার মহাশয় বা দিদিমণি পিঠের পর দিব্বি বাগবাজারের রসগোল্লার রস মাখিয়ে দেবেন।

দাড়োয়ানের দেওয়া লোকটী আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগল। পর পর কয়েকটী তোড়ন পার হবার পর দেখা গেল সেনাপতির দ্বার। সেটাও অতিক্রম করে দেখা

গেল একটী ক্ষীর দীঘি। দিব্বি সেখানে দলে দলে শ্বেত রাজহংস ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। সাড়ি সাড়ি পদ্মফুল। কোনটা ফুটে রয়েছে, কোনটার অর্দ্ধস্ফোটন্মুখ অবস্থা। তোমরা হয়ত মনে করবে, আমি তোমাদের ছেলে মানুষ পেয়ে বানিয়ে বানিয়ে সব মিথ্যে কথা বলছি।

কিন্তু সত্যি এর একটাও মিথ্যে কথা নয়। চোখে যদিও দেখিনি তবু বিশ্বাস করো এ গুলো খুব সত্য কথা। অলোকের কিন্তু এসব দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। তার মন সব সময় চঞ্চল, কখন কল্পনাকে দেখতে পাবে, কখন রাজকুমারীর সাথে কথা বলবে। কেমন দুষ্টু ছেলে দেখ ত! ভারি মেয়ে ভালবাসে। কেমন থৈ থৈ করে দৈ আর ক্ষীর। আমি হ'লে ত এক চুমুক খেয়ে নিতুম। তোমরা কি করতে জানি না। ওর মন কেবল কল্পনা! কল্পনা! কল্পনা ছাড়া ও যেন কিছুই জানে না।

ক্ষীর দীঘি পার হ'য়ে দেখা গেল আর একটী তোড়ন। সেখানে দ্বারে কোন লোক জন নেই। মাত্র দুটী কপোত আর কপোতী। ওরা যেতেই বগ্-বগম্ করে উঠলো। লোকটী কি যেন ইশারায় বল্লে। দোরের দরজা খুলে গেল। অলোককে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েই লোকটী বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে দরজাটী গেল বন্ধ হ'য়ে। নিশ্চয়ই এদেরও দস্যুদলের মত 'সীসেম' বা ঐ রকম একটী মন্ত্র জানা ছিল, যা আওড়ালে রাজকুমারীর দরজা ইচ্ছামত বন্ধ করা বা খোলা যেত। ভাবরাজ্যের সবই ভাবে ভরা। আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা দায়।

অলোক কি করবে ভেবে পায় না। এ আবার কোথায় এলো। দু'এক পা এগিয়ে যেতেই দেখে সোণার পালঙ্ক, কত কারুকার্য্য করা তাতে। কত রকমের মণিমুক্তা রয়েছে বসান। দু'একটী ছাড়া কোনটাই অলোক চিনে নিতে পারলো না। আর

কল্পনা

ঐ পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে একটী মেয়ে। মস্তকের কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে পালঙ্ক বেয়ে নীচে, সাপের মত এঁকে বেঁকে। ওর মনে পড়লো ওর ঠাকুমা রূপকথায় বলতেন রাজকন্যাদের নাকি মেঘবরণ চুল। গায়ের রং রজনীগন্ধার মত স্নিগ্ধ। অলোক দাঁড়িয়ে থেকে শুধু নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগলো। যেন দেখবার আকাঙ্খা তার পূর্ণ হয় না। অনুমানে বুঝে নিল এই রাজকন্যা।

কল্পনা স্বপ্ন দেখছে। দূর দেশ থেকে এক রাজ পুত্তুর এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। তার রূপের প্রভায় ভাব রাজ্যও মোহিত হ'যে গেছে। তার মুখের কথা এতই মিষ্টি কোকিলও লজ্জায় চুপ করে যায়। সে এসে ডাকছে কল্পনাকে "কল্পনা আমি এসেছি তোমাকে নিতে ওঠ দেখ।" কল্পনা হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু। কিন্তু তার পর? কোথায় সে রাজপুত্র? কল্পনা নিজেই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

'রাজপুত্র রাজপুত্র' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলো। ঘুম গেল তার ভেঙ্গে। ঘুমপবাণী পরীর দল নাচতে নাচতে দূরে সরে গেল। ওরা আবার অপরাপর পরীদের মত ঝামেলা ভালবাসে না।

চোখ মেলে সামনে চেয়ে দেখে ত এক অপরিচিত যুবক। থতমত খেয়ে গেল কল্পনা। তবে কি তার স্বপ্ন সত্য! কিন্তু এত রাজপুত্র

কল্পনা থতমত খেয়ে গেল!!!

নয়, এত মানুষ। সাধারণ বেশে সজ্জিত। তবু ওরই ভিতর-যেন তার অসাধারণ ভাব জেগে উঠেছে। দু'জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তারপর কল্পনা বল্‌লো—

"তুমি কোত্থেকে এসেছ? কি চাই, কি করে ভাবরাজ্য ভেদ করে কল্পনালোকে এসে ঢুকলে? কেউ তোমায় বাধা দেয়নি?"

পর পর কল্পনার এতগুলো প্রশ্নের কোনটীর জবাব আগে দেবে অলোক ভেবে পাচ্ছে না। ঘাব্‌ড়ে গেছে। আর সত্যিই ঘাবড়ে যাবার কথা। তোমরাই বল না কেন? কোন অপরিচিত লোক যদি তোমাদের এরকম প্রশ্ন করে, তোমাদের অবস্থাটা কি হয় তখন? ওর 'ভ্যাবা-চ্যাকা' ভাব দেখে কল্পনা হেসেই বাঁচে না।

"আমি বাংলা থেকে এসেছি।"—'বাংলা'! নামটী কত মধুর! এমন নাম কল্পনা তার কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

'তার পর?'

উদ্‌গ্রীব হ'যে আছে কল্পনা। অলোকের কথা শুনবার জন্য।

"আমি এসেছি রাজকন্যার সাথে দেখা করতে।"

জিবের জড়তা কেটে গেছে অলোকের। ধীরে ধীরে রাজ-কুমারীর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল। কিন্তু অলোকের কথা খুব ভাল লাগে কল্পনার কাছে। যত বলে অলোক—যত শোনে কল্পনা, শোনবার ইচ্ছা যেন তার প্রবল ভাবে জাগে।

"তোমাদের বাংলা কেমন? আমাদের ভাবরাজ্য থেকেও সুন্দর?"

"নিশ্চয়ই রাজকন্যা। সেখানে নদীতে বয় দুধ আর মধু। তোমার এই ক্ষীর দীঘির মত এতটুকু নয় তার পরিধি। এর চেয়ে ঢের ঢের বড়, ঢের ঢের ভাল।" তারপর এক এক ক'রে বলে যেতে লাগল বাংলার কথা। যত বলে কল্পনার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

কল্পনা

তোমার নাম ?

"অলোক।

"আমায় নিয়ে যাবে বিদেশী, তোমাদের দেশে ?"

'যাবে তুমি রাজকন্যা ?"

কল্পনার ভারি ভাল লাগে অলোকের উচ্চারিত 'রাজকন্যা' ডাক।

সারা রাজ্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে অলোককে দেখাতে লাগলো কল্পনা। অলোক ত অবাক ! কল্পনা বলে, 'কেমন লাগছে অলোক ?"

"কি সুন্দর রাজকন্যা !"— অলোক উত্তর দেয়।
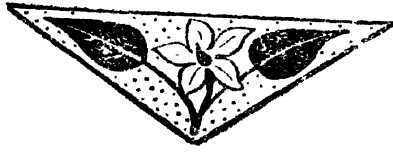
—ছয়—

রাজ্যের প্রত্যেকেই ভালবাসতে লাগল অলোককে ঠিক কল্পনার পরই। অলোকও সকলকেই তেমনি ভালবাসত। এক মুহূর্ত্তও কেউ অলোককে ছাড়া থাকতে পারতো না। সব সময়েই ঘিরে ধরতো তারা অলোককে—বাংলার কথা শুনবার জন্য। অলোক বলে যেত, শ্রোতার দল শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে যেত। বাংলায় আসবার জন্য সকলে করতে থাকতো ছটফট্। অলোককে সকলে বাসতো ভাল। ভাবরাজ্যের যা সুন্দর তাই রেখে দিত ওর জন্য।

অলোক থাকতো রাজকন্যা কল্পনার প্রাসাদের পরই। কল্পনা জানলা খুলে দেখতো অলোক বসে বসে হয়ত লিখ্ছে। কবিতা আওড়াচ্ছে, নয়ত ভাবরাজ্যের আকাশ পানে উদাস মনে চেয়ে আছে। কল্পনার ইচ্ছা হ'তো এক ছুট দিয়ে যায় অলোকের কাছে। চুপি চুপি টিপে ধরে অলোকের চোখ। অলোক যতক্ষণ না বলতে পারবে ততক্ষণ কিছুতেই আর চোখ ছাড়বে না। কল্পনা অলোককে খুব ভালবাসে কিনা, তাই। অলোক যে কত ভালবাসে তা ত পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি।

*   *   *

সেদিন ভারি এক মজার ব্যাপার ঘটেছে। তোমরা শুনলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়ে উঠবে। শোন তবে ভেঙ্গেই সব বলছি। কিন্তু প্রথমেই হেস না কিন্তু!

কল্পনা ত রোজ রোজ ভাবে, আচ্ছা 'অলোক এত কার কথা চিন্তা করে?' অলোকের মনে কেবলই খটকা লেগে যায়—আচ্ছা কল্পনা যে অত ভাবে ফুলের মালা গাথে কার জন্য?' সেদিন অলোক

এমনি বসেছিল। টেবিলের পর ডাইরীটা পড়েছিল। কেবল লেখা শেষ করে ফেলেছে। কল্পনা আস্তে আস্তে পেছন দিক থেকে অলোকের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক ত ডাইরী বইতে লিখেছে কেবল কল্পনার কথা। কল্পনাকে সে ভালবাসে, কল্পনাকে সে বাংলায় নিয়ে যাবে—বাংলা মায়ের পুঞ্জীভূত ব্যথা দূর করবে ও আর কল্পনা। আরও কত কি লিখেছে। হঠাৎ কল্পনার ঘরের পানে তাকিয়ে দেখে সে আব সেখানে নেই। এই ত সুযোগ! আস্তে আস্তে ও চল্‌লো তার ঘরের পানে।

সন্ত্রস্ত ভাব। পাছে কেউ দেখতে পায়! বাইরে থেকে উঁকি মেরে প্রথমে দেখে নিল সত্যিই কল্পনা ঘরের ভিতর আছে কি না! যখন দেখলো নেই, বীরপুরুষের মত ঢুকে পড়লো ঘরে। যেয়ে যা দেখে—কল্পনার সারা ঘরে অলোকের নাম লেখা। বাংলার সুন্দর একখানা মানচিত্র অলোক কল্পনাকে দিয়েছিল। সেটির গলায় দেখে ফুলের মালা। আর তাতে লেখা বড় বড় হরফে—কল্পনালোক। কল্পনা আর অলোকের সন্ধি অর্থাৎ মিলন হ'লে যা হয়। দেখছ কি দুষ্টু মেয়ে!

অলোকের মন ত ভাদ্রের ভরা নদীর মত আনন্দে উপচে উঠেছে। দূর থেকে কল্পনাকে দেখে মুখ তার লজ্জায় লাল হ'য়ে গেছে। ও ধারণাও করতে পারেনি যে, অলোক উঠে ওরই ঘরে যাবে। কি আর করা! একান্তই যখন নিরুপায়। অলোকের ডায়রীখানাকেই বুকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে দিব্বি ভার গম্ভীর হ'য়ে কল্পনা নিজের ঘরেই আবার ঢুকে দুরজা বন্ধ করে দিল। কেমন ভাল মানুষটা সে যেন কিছুই জানে না। দরজাটা যেই বন্ধ হ'য়ে গেল একটু শব্দ করে, তার 'আওয়াজে' ভাঙ্গলে অলোকের চমক। সামনে দেখে কল্পনা। 'ধ্যাৎ, এর চেয়ে মরণও যে ভাল ছিল……।'

'ঘরের মালিকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকলে, মনে করতে হবে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। বাংলার লোকদের চুরি বিদ্যায়ও যে দক্ষতা আছে তা ত শুনিনি কোনদিন।

অলোকের সারা গা ঘেমে উঠেছে। তোমরাই বল না কেন? তোমরা যদি এরকম অবস্থায় পড়তে তোমাদের মনের অবস্থা কি রকম হতো?' অলোকের ভাব দেখে কল্পনার ভারি দয়া হ'লো! হাত ধরে নিয়ে তার পালঙ্কের 'পর বসাল। তারপর বুকের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বের করলে। তার ডায়েরী খানাকে। অলোকের মুখ ত ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। কল্পনাও যে কম অপ্রস্তুত হ'য়েছে তাও তোমরা মনে কর না।

অনেক দিন যায়। ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী। ভাবরাজ্যে ভাবদেবতার উৎসবের দিন। অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত আজ ভাবনগরী। তোড়নে তোড়নে মঙ্গল ঘট। ঘরে ঘরে উলুধ্বনি আর মঙ্গল আরতি। ভাব দেবতার মন্দিরের আরতির ধোঁয়ায়— ভাবে বিভোর আজ ভাবরাজ্যের অধিবাসী। দলে দলে মালী সাজি সাজি ফুল মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে দেবতার মন্দিরে। ভাবরাজ্যের উদ্যান থেকে ফুল সংগ্রহ করে। বাতাস তার গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দ্দিকে। ছোট বড় সবাই আজ উৎসবে মেতে উঠেছে। ভাব দেবতার অর্চ্চনা হবে। সারা রাজ্য নূতন সাজে সেজেছে। রাজকুমারী কল্পনাও কোন ত্রুটি করেনি।

প্রতি বছরই এমনিভাবে সে সেজে থাকে - আর মন্দিরে যেয়ে প্রার্থনা করে ভাবদেবতার কাছে -ভাবরাজ্যের মঙ্গলের জন্যে। এবারে কিন্তু অন্যান্য বছরের চেয়েও এক অভিনব রূপসজ্জায় সে হ'য়েছে সজ্জিত। অন্যান্য বছর রাজকুমারী একাই এদিনে আসতো।

মন্দিরে। আর আজ? আজ আর একা নয়। সাথে অলোক। সেও নূতন বেশে সজ্জিত। অলোককে যারা চিনতো—অলোককে রাজকুমারীর পার্শ্বে দেখে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলো। সত্যিই রাজকুমারী কল্পনাকে আজ কত সুন্দর দেখাচ্ছে। যারা চিনত না অলোককে তারা একটু অবাক হ'য়ে গেল।

ওরই ভিতর ছিল একজন সে কল্পনাকে বিয়ে ক'রে রাজ্য পাবার গোপন ইচ্ছা পোষণ করতো। রাজকন্যার এই অভিনব সাজে তারই প্রাণে দিতে লাগলো ব্যথা। হিংসায় জ্বলতে লাগলো তার সারা অন্তর।

ভাবরাজ্যের পরীরা নাচতে নাচতে এসে দিল ওদের দুজনের গলায় মালা পড়িয়ে। চারিদিক থেকে হ'তে লাগল পুষ্পবৃষ্টি। নূতন উন্মাদনায় মেতে উঠেছে আজ ভাবরাজ্য। ভাবদেবতার উৎসবের সঙ্গে আজ যে তাদের রাজকন্যারও মিলনোৎসব। রুদ্রসিংহ একথা শুনলো তাদের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। নেকড়ে বাঘের মত জ্বলে উঠলো তার দু'চোখ। উৎসবের কোন আনন্দ এবার তার প্রাণে দিতে পারেনি সাড়া। উৎসবের আড়ম্বরে—আরতির ছন্দে ও তালে—জ্বলে উঠলো তার অন্তরে প্রতিহিংসার তীব্র অনল। দেবতার মন্দিরে নতজানু হ'য়ে অলোক আর কল্পনা একসঙ্গে নিল আশীষ। দেবতার মুখে হাসি—তাই উৎসব হ'য়ে উঠেছে সাফল্যমণ্ডিত।

—সাত—

উৎসবের আনন্দ ধীরে ধীরে গেল থেমে। রুদ্রসিংহের মনে যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে—এতদিন কোনমতেই তা নির্ব্বাপিত হয়নি। বরং দিন দিন চোখের সামনে অলোক আর কল্পনাকে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখে—তাতে আরও ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে। রাজকন্যা কল্পনা আর অলোক হ'লো তার শত্রু। যেমন ক'রেই হোক অলোকের মৃত্যুসাধন তার চাই-ই। আর কল্পনা—না—না, ওখানটায় তার দুর্ব্বলতা। অলোক মরলেই কল্পনা মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়েও পাবে ভীষণ যন্ত্রণা—তাতেই ওর হবে আনন্দ।

ভাদ্রের ভরা জল নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে। বাংলার নদীগুলো ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে জানিয়ে দিচ্ছে বাংলা মাকে—তার অলোক কতদিন দেশছাড়া। তার অলোক এখনও এল না। মা যে কি করবে ভেবে পায় না। দু'চোখ বেয়ে কেবল গলধারে তাই জল পড়ছে। সন্তানের অমঙ্গলের চিন্তায় তাই মায়ের মন কেঁদে উঠেছে। এদিকে রাজ্যে উৎসবের মহড়া পড়ে গিয়েছে। ক্ষেতভরা শস্য—না তুলে ত কোথায়ও নড়বার অবসর তার নেই।

অলোক আর কল্পনা সেদিন পাহাড়ের ওপর বেড়াতে গেছে। সঙ্গে কল্পনার মেঘলা নামে ময়ূরটী।

কল্পনা বলছে, "অলোক আমরা বাংলায় যেয়ে তাকে ভাবময় করে তুলবো। সেখানে সৃষ্টি করবো নূতন ভাবরাজ্য—এর চেয়েও

ভাবে ভরা। তোমার ভাইদের কথা শুনেছি, সারাদিন কষ্ট করে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করেও তারা নাকি সারা বছর পেট ভরে দুটো খেতেও পায় না। চলো অলোক—আমি যাবো তোমদের বাংলায়। কেন মিছে মিছি তুমি মন খারাপ কচ্ছ, তোমার মায়ের বুকে কোন দুঃখ দারিদ্র্য থাকবে না।"

"কল্পনা তুমি আমাদের মাকে চেন না। তাকে যখন দেখবে—বুঝবে স্বর্গের দেবীর চেয়েও এ দেবীর স্থান কত ওপরে। স্বর্গের দেবীও নিজের ভালই দেখেন। আর আমার মায়ের কথা শুনবে? সে কখনও নিজের ভালর কথা চিন্তা করে না। তাঁর ছেলে মেয়েও তেমনি ভাবে গড়ে উঠেছে। নিজের ঘরে খাবার থাক বা না থাক, সেদিকে দৃষ্টি নেই—আহুত অনাহুত বুভুক্ষের জন্য প্রাণ উঠে তাদের কেঁদে! তারা যে খেতে পায় না, খাদ্যের অভাবে নয়। খাদ্য তাদের প্রচুরই আছে। বাংলায় যেয়ে দেখতে পাবে কল্পনা—বাংলার ধনে, বাংলার সম্পদে, বিদেশী কত সম্পদশালী হ'য়ে উঠেছে।

মায়ের যে অফুরন্ত ভাণ্ডারের কথা তোমায় বলেছি, তাও শেষ হয় হয় তবু মায়ের সেদিকে খেয়াল থাকে না। মা কি বলে জান? বলে 'আমার ছেলেরা যদি বেঁচে থাকে সব হবে।' এই যে শরৎকাল আসছে, এখন মা করবে কি—মায়ের আদেশে তার ছেলে মেয়েরা সমস্ত ধনভাণ্ডার দেবে খুলে। আর চীৎকার করে ডাকবে—

"আয় আয় আয়—আছ যে যেথায়, আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী অন্ন যেতেছে লুটিয়া!"

তোমাদের এখানে ভরা পেটেও আমায় আনন্দ দেয় না, যতটা আনন্দ পাই মায়ের কোলে খালি পেটে থেকেও। আমার মা যে বিশ্বের মা, কল্পনা! বিশ্বের প্রতি জীবজন্তুর ওপর কত তাঁর দরদ। আমার মা যে বিশ্বের মা, সেই ত সবচেয়ে আমাদের বেশী গরব, কল্পনা।"

অলোক আর কথা বলতে পারে না। কতদিন ও মাকে

দেখে না। ভাবরাজ্যে এসে মার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ওর প্রতি শিরায় শিরায় চঞ্চলতা বেড়ে উঠেছে মায়ের জন্য। ওর মন আজ কেঁদে উঠেছে শিশুর মত। তাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কল্পনার কোলে মুখ লুকিয়ে।

ছিঃ অলোক! কি ছেলেমানুষ তুমি।

"কল্পনা! মায়ের জন্য মন বড় কেঁদে উঠেছে। যদি সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস, চল এই শরতেই মায়ের পূজার পূর্ব্বেই আমরা মায়ের কোলে যাই।"

কল্পনা সত্যিই অলোককে ভালবাসে। বল্লো, "আচ্ছা অলোক আমরা যাবো। ভাদ্রের অমাবশ্যাকে ভাবরাজ্যের লোকেরা ভয়ানক ভয় করে। ওদিন সকলে থাকবে অচেতন। আমরা দু'জনে দেব ছুট। খবদ্দার কাউকে একথা বলো না যেন। তাহ'লে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে।"

রুদ্রসিংহ সব সময় ছায়ার মত ওদের অনুসরণ করে বেড়াত। ফাঁক খুঁজতো যখনই সে একা অলোককে পাবে, তখনই শেষ করে দেবে। কল্পনা কিন্তু কোন সময়ও কাছ ছাড়া করতো না অলোককে। রুদ্রসিংহ এখানে আসতেও ভুল করেনি। সব শুনে নিল। কিন্তু কাউকে কিছু বল্লো না—কারণ ওদের দুজনকেই সবাই বাসত ভাল! যদি কোন রকমে কেউ রুদ্রসিংহের মনের দুরভিসন্ধির কথা জানে আর রক্ষে রাখবে না। তাই মনে করলো ও ঐ অমাবশ্যার রাত্রে জেগে থাকবে। পেছন থেকে—যেই শুরু। ভাবরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে যাবে—দেবে অলোকের জীবনলীলা শেষ করে।

—আট—

ভাদ্রের অমাবশ্যার রাত, চারিদিক নিঝুম অন্ধকার—ভাবরাজ্যের সবাই নিদ্রায় অচেতন—এমন কি সেনাপতি আর দ্বারি পর্য্যন্ত। জেগে আছে কেবল কল্পনা আর অলোক। আর—আর রুদ্রসিংহ। অন্তরে তার দাউ দাউ করে যে প্রতিহিংসার অনল জ্বলছে প্রতিদিন, ভাবদেবতার অর্চ্চনার দিন থেকে তাতে জুগিয়ে এসেছে ইন্ধন। আজ সে তার পূর্ণাহুতি দেবে অলোকের রক্তে। অলোকের রক্তের আস্বাদনে সে আজ উন্মাদ। তার কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই। সাধারণ বুদ্ধি তার লোপ পেয়েছে বহুদিন।

রাত্র দ্বিপ্রহর। "কল্পনা"—অলোক ডাকে। কল্পনা বলে—'চুপ'। সেনাপতির ঘরের কাছে যেতেই ঝনাৎ করে শব্দ হ'লো। দুর দুর করে কেঁপে উঠলো কল্পনার মন। অলোক বলে—'ও কিছু নয়।' দুজনে আবার চলতে থাকে। হঠাৎ সামনে দিয়ে কি যেন যায়। কল্পনা জড়িয়ে ধরে অলোককে। অলোক বলে—

'ভয় নেই ও আবছায়া।'

ভাবরাজ্যের তোড়ন-দ্বারের কাছে তারা এলো, বিভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে দারোয়ান। ওরা রাজ্যের সীমার বাহিরে বেরিয়ে এলো।

"অলোক! আমার মেঘলাকে যে আনিনি। ও আমাকে না দেখে থাকতে পারবে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি। এখান থেকে নড়োনা কিন্তু!"

কল্পনা এক দৌড়ে গেল তার মেঘলাকে আনতে। মেঘলাকে তোমরা নিশ্চয়ই জান? পূর্ব্বেই মেঘলার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। ও হ'চ্ছে কল্পনার প্রিয় ময়ূর।

ভাবরাজ্যের সেনাপতির একরকম অস্ত্র ছিল। তা ছুড়ে কাউকে আঘাত করা মাত্রই তার জীবনলীলা শেষ হ'য়ে যায়। রুদ্রসিংহ করেছে কি—চুপি চুপি সেনাপতির ঘর থেকে নিয়ে এসেছে সেই অস্ত্র। ছুটতে ছুটতে এসে ওদের অপেক্ষায় দ্বারের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সুযোগ খুঁজছিল। তাত জুটেই গেল। কল্পনা চলে গেছে আড়ালে। আর যে অন্ধকার কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

অলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত্তগুলি গুণছে। কল্পনা এই কখন ফিরে আসে। ওরা তারপর যেয়ে পৌছবে বাংলায়। ওর মনে কত স্ফুর্ত্তি, কতদিন মাকে দেখে না—কতদিন বাংলার বাতাস গ্রহণ করে না। কতদিন ও দেখে না বাংলার রং-বেরংএর ফুল। না, কল্পনা ভয়ানক বিলম্ব করছে। এক দু'—পা করে এগিয়ে দেখতে গেছে। আর কোথা যাবে।

নিষ্ঠুর রুদ্রসিংহ শরীরে তার যত বল ছিল - সংগ্রহ করে ছুঁড়ে মারলো সে অস্ত্র। তারপর সব শেষ। ধনুখানা সঙ্গে সঙ্গে গেল খান খান হ'য়ে। ভাবরাজ্যের চূড়ার পর থেকে সাত সাতটী ময়ূর নেমে এসে একসাথে কামড়ে কামড়ে শেষ করে দিল—রুদ্রসিংহের কলঙ্কিত জীবনের।

কল্পনা এরই মাঝে এসেছে চলে। বুঝতে তার বাকী রইল না কিছুই। সব আশা এক মুহূর্ত্তে শেষ হ'য়ে গেল। কল্পনার তখন-কার আকৃতি যদি দেখতে নিতান্ত পাষণ্ড যে, সেও চোখের জল না ফেলে পারতো না। অলোকের মৃত দেহ জড়িয়ে ধরলো বুকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কল্পনার সব কল্পনাই আজ হ'লো ব্যর্থ। আজ কল্পনা নিঃস্ব। অতবড় ভাবরাজ্য প্রেতপুরীর মত মনে হ'তে লাগলো। ওদিকে সে তাকাতেও পারে না।

সামনে দেখে পরে রয়েছে রুদ্রসিংহের ক্ষত বিক্ষত দেহ। প্রতিহিংসায় ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠলো তার চোখ। শ্মশানী

মায়ের মত উঠলো সে মেতে। আলুথালু কেশ—বুঝি সৃষ্টি ধ্বংশ করে! মেঘলা যেয়ে ডেকে নিয়ে এলো সাত সাতটী ভাবরাজ্যের সেরা শিকারী কুকুর। ছিন্ন ভিন্ন করে দিল এক মুহূর্ত্তে রুদ্রসিংহের পাপ দেহকে। পরে রইল ক'খানা জীর্ণ অস্থি! তারপর ময়ূর রথে তুলে নিল অলোকের মৃতদেহ। যেন স্বর্গ-বৃন্তচ্যুত কুসুম। সম্মুখে মেঘলা—চারিপাশে সাতটী ময়ূর টেনে নিয়ে যেতে লাগলো রথ। বাতাসের চেয়ে বেগে ছুটলো ওরা বাংলার দিকে।

কল্পনা অলোকের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরলো!!! (পৃঃ ৩৭)

ভোর হ'য়ে গেছে। ভাবরাজ্যের চারিদিক নিমিষে ছড়িয়ে পড়লো অলোক আর কল্পনা নেই। রুদ্রসিংহের কঙ্কালের পার্শ্বে উল্লাসে নাচছে, যমসম ভাবরাজ্যের কুকুর সাতটী। পুরোহিত মন্দিরের দোর খুলে দেখে দেবতার চোখে জল। ধ্যানে বসলো। ভাবতে পারে না পুরোহিত। যে কল্পনা আর অলোককে দেবতার সামনে দেবতাকে সাক্ষ্য করে সে বেঁধে দিয়েছিল মিলনসূত্রে—সেই অলোকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ময়ূর রথে। আর আলুথালু বেশে তাই জড়িয়ে ধরে পরে রয়েছে রাজকুমারী কল্পনা। ভাবরাজ্যের মূর্ত্তিমতী একাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

তারপর আবার ধ্যানস্থ হ'লো পুরোহিত। দিব্য চোখে সব ভেসে উঠলো তার সামনে। হাহাকার পরে গেল ভাবরাজ্যে। দেবতার চোখের জল আর থামে না। দেবতার চোখের জল-ধারায় সৃষ্টি হ'লো বেগবতী স্রোতস্বতীর—তাতেই ভাবরাজ্য গেল ভেসে। ভ্রুক্ষেপ নেই দেবতার সেদিকে; আজ সৃষ্টি ধ্বংশ করবে। ভাব-রাজ্যের পাগলা দেবতা আজ পাগল হ'য়ে গেছে। সব বাঁধন গেছে তার চুকে। কি করবে আর সে ভাবরাজ্যে থেকে?

শেষ পর্য্যন্ত মন্দিরও ভেসে গেল তারই চোখের জলের স্রোতে। দেবতা নিজেই স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে সামনে যা পড়লো সব ভেঙ্গে চুড়ে ছুটলেন বাংলার দিকে।

—নয়—
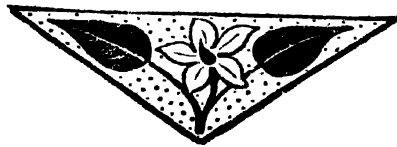
বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের মহড়া চলছে। ধনী, দরিদ্র সবাই মেতে উঠেছে আজ আনন্দে। প্রতি বছর এমনি ভাবে বাঙ্গালী করে তাদের মায়ের আরাধনা। প্রতি বছর এমনি ভাবে মেতে উঠে তারা মাতৃ-বন্দনায়। জাতের বিচার নেই—উচ্চ নীচের ধার ধারে না। বাঙ্গালী জানে তারা ভাই ভাই। তারা সবাই বাংলা মায়ের সন্তান। দেশ দেশান্তর থেকে দলে দলে বিদেশীয়েরা ভিড় করতে থাকে বাংলার ঘাটে, দেশী বিদেশী পণ্যদ্রব্যে বাংলার বাজার হ'য়ে ওঠে সব ভরপুর। আর তারই ভিতর মা এ'সে দাঁড়ান নিয়ে তার অফুরন্ত অভয় আশীষ।

বেশ ভুষার কোন আড়ম্বর নেই মায়ের! শ্যামলী বেশে শ্যামলী মাকে বেশ দেখায়—ওতেই তাকে দেখায় অসাধারণ। তাই বিদেশী ভুলে যায় সত্যিই তারা বিদেশী কিনা। মা—মা বলে মায়ের ছেলে মেয়ের সাথে তারাও যোগ দেয় মাতৃ-বন্দনায়। তারাও নত-জানু হ'য়ে গ্রহণ করে মায়ের অভয় আশীষ।

চারিদিকে উৎসবের ধুয়া পরে গিয়েছে। কিন্তু মায়ের মনে নেই শান্তি। প্রকৃতি তাই নিস্তব্ধ! নদীর আর সে উচ্ছ্বাস নেই। তীর্ তীর্ করে গুমরে গুমরে সে ছুটে চলেছে। যেন কত দুঃখ, কত ব্যথা তার হৃদয়ে। সারা বাংলার বুকে আজ উৎসবের মহড়া চলেছে অথচ তাতে মোটেই যেন নেই আন্তরিকতার ছোঁয়াচ। সবই উদাসী।

আট ময়ূরের টানা রথের পূর্ব্বেই ভাবদেবতা এসে পৌঁছিলেন বাংলায়। বঙ্গোপসাগরের নাম তোমরা শুনেছ, সেই পুণ্যস্থানে

স্রোতের সাথে মিশল ভাবদেবতা। বাংলার কাণে কাণে তার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিতে শোকে মা পড়লেন মুষড়ে। দেবতাও ঠিক থাকতে পারলো না। বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের সাথে সাথে উপচে উপচে পড়তে লাগল তার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস। মা আর দেবতার অশ্রুতে সৃষ্টি হ'লো নূতন তীর্থের। এখানে স্নান করলে ভুলে যেতে হয় শোক তাপ। সেদিন থেকে দেবতা রইলেন বাংলায়—মায়ের দুঃখ লাঘব করবার জন্য।

ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো বাংলার আকাশ। কাঁদতে কাঁদতে কল্পনার অশ্রু গেছে জমাট বেঁধে। মায়েরও তাই। দেখ না শরতের মেঘে কোন দিন বর্ষণ হয় না। মাত্র শিশির পড়ে। শিশির আর কিছুই নয়—মায়ের আর কল্পনার জমাট বাঁধা অশ্রু। বেশী শোক যারা পায় তাদের কান্নায় জল থাকে না। কল্পনার রথ এসে নামল বাংলায়। দু'হাত দিয়ে মা জড়িয়ে ধরলেন তার ছেলে আর পুত্র-বধূকে। এক হাত দিয়ে মোছেন অশ্রু আর একহাত দিয়ে সান্ত্বনা দেন পুত্রবধূকে গায়ে হাত বুলিয়ে।

ভাবদেবতার আদেশে মায়ের অন্যান্য ছেলেরা মায়ের ভাণ্ডার থেকে নিয়ে এলো মুর্শিদাবাদের সিল্ক—ঢাকার তাঁতীদের তৈরী ওড়না। পরিয়ে দিল পূতবাস অলোকের মৃতদেহে। মায়ের আদেশে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থলে স্নান করালো অলোককে। আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে দুই নদীর একত্র মিলনের ধারার সঙ্গে মিশে গেল অলোকের দেহ। আর ঐ সঙ্গম স্থলে ফুটে উঠ্‌লো একটী পদ্মফুল! তাতে ১০৮টী পাঁপড়ি—১০৮ বর্ণে ও-টী রঞ্জিত! সকলে ত অবাক্! মায়ের মুখ শান্ত-স্থির। যেন তিনি পূর্ব্ব থেকেই জান্‌তেন এমনটী হবে। সেই থেকে এখানে সৃষ্টি হ'লো নূতন তীর্থের—অলোক তীর্থ নামে। আর ভাবদেবতা বাংলার নাম রাখ্‌লেন কল্পনালোক।

ভাবদেবতার নূতন নামে মা হলেন ভূষিতা। মনে পড়ে

কল্পনা এমনি ভাবে অলোকের দেওয়া বাংলার মানচিত্রের পরে নাম লিখে মালা পরিয়ে দিয়েছিল। ভাবদেবতার কাছে তা আর গোপন রয়নি। কল্পনার কল্পনা আজ তাই বাস্তবে পরিণত। মুখে এত দুঃখের মাঝেও ফুটে উঠেছে হাসির রেখা। মা খেলেন আদর করে তার পুত্রবধূর গণ্ডদেশে চুম্বন। কল্পনাকে দীক্ষিত করলেন নূতন ব্রতে।

সেই থেকে কল্পনা আছে, বাংলায় বাঙ্গালীকে সে খুব ভালবাসে। অপরকেও যে না বাসে তা নয়। মা যে তাকে বিশ্ব প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন। তবু বাঙ্গালীদের প্রতি কল্পনার অসম্ভব টান। সে বাঙ্গালীর অন্তরে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অলোকের অন্তর, বাঙ্গালীর মনের গোপন কোনে উঁকি মারে, সত্যি তারাও অলোকের মত কল্পনা করে কিনা—বাংলার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য। ভদ্রা জননীর নাম তোমরা শুনেছ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কেবল শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলের শুশ্রূষা করে বেড়াতেন। নাইট্যাঙ্গেলের নাম জান কিনা জানি না। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনিও বৃটিশ সৈন্যদের শুশ্রূষায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তোমরা হয়ত বলতে পারো আমি সব মিছে কথা বলছি— কিন্তু বাস্তবিকই তা নয়।

কল্পনা বাঙ্গালীদের কাছে কাছে থাকে। যে দুঃখী তার প্রাণে দেয় আনন্দ। বেশ আমার কথা সত্যি কিনা একদিন পরীক্ষা করে দেখ। ধর যদি কোন সময় পড়াশুনা ভাল না করতে পার, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'লে বাবা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তুমি হয়ত রাগে পুষ্করিণীর পাড়ে—কি কোন এক গাছে উঠে ভাবছ 'ধ্যাৎ এ

জীবন আর রাখব না!' যেই মরতে যাবে যাবে মনে ভাবছ—অমনি কল্পনা দৌড়ে এল তোমার নিকটে।

এসে বল্‌লো—ছিঃ ভাই রাগ কর কেন? মনযোগ দিয়ে পড়া শুনা কর। আজ নয় তুমি অকৃতকার্য্য হয়েছ কিন্তু এমন দিন আসবে তোমার সব পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে। দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যাবে তোমার কথা। তোমার প্রশংসায় সকলে হ'য়ে উঠবে পঞ্চমুখ। বাংলা মায়ের বুক ফুলে উঠবে গর্ব্বে। তোমার আর মরা হয় না। মন থেকে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। তুমি ঘরে ফিরে এসে মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ কর। কল্পনা এম্‌নি ভাবে সকলকে ভালবাসে।

তোমাদের হয়ত এরোপ্লেন দেখে দুঃখ হয়। তোমাদের অর্থ নেই, অবশ্য যাদের আছে তাদের কথা বলছিনে। আর অর্থ থাকলেও মা বাবা ত অনুমতি দেবেন না! তোমরা এরোপ্লেনে চড়তে চাও অথচ পাব না, মন ভার করে থাকো। কল্পনা তোমাদের মনের কথা টের পায়। এক মুহূর্ত্তে তোমাদের সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌বে এরোপ্লেনে। যা তুমি চাইবে কল্পনা করবে তাই পূরণ। কিন্তু তোমাদেরও কল্পনাকে ভালবাসা চাই। তোমরা হয়ত বলতে পার কল্পনাকে দেখতে পাই না, তা কি করে ভালবাসব? হাঁ কল্পনা মায়ের সাথে বাংলার পঞ্চভূতে মিশে আছে। তাকে ভালবাসা মানে সে অদৃশ্য থেকে তোমাদের যা করতে বলবে তাই করবে। তবেই অলোকের জন্য কল্পনার যা দুঃখ অন্ততঃ কিছুটা দূর হবে। কল্পনা আরও বেশী করে ভালবাসবে।

তোমরা যেদিন কল্পনার কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে পারবে, তোমরা বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল—তরুণ তরুণীর দল, তোমরাই বাংলার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, সেদিন শিক্ষায় দীক্ষায় চাল চলনে কথাবার্ত্তায় কাজকর্ম্মে পারবে কল্পনার কল্পনাকে

কাজে পরিণত করতে, আমরা যারা বুড়ো হ'য়ে গে'ছি দূর থেকে শুনে আনন্দ পাবো। অলোক আবার সেদিন পদ্মফুল হ'য়ে তোমাদের দেখতে ফুটে উঠবে গঙ্গা যমুনার মিলন তীর্থে। অলোকের জন্য কল্পনার সব দুঃখ যাবে ঘুচে। কল্পনার কল্পনা করা বাংলার নূতন নাম কল্পনালোক, সেদিনই হবে সার্থক। আর তোমাদের জন্য আমি যে এই অলোকের গল্প লিখলাম্—তাতে আমার যা কষ্ট হ'য়েছে—অলোকের কথা মনে হ'তে হ'তে যা কেঁদেছি, ঝরণা কলম ধরে থাক্‌তে থাক্‌তে যা বেগ পেতে হয়েছে, সেদিনই সব হবে সার্থক।

আচ্ছা আজ আসি। আর এক কথা ভুলে যেওনা যেন, আমাদের নির্য্যাতিতা প্রপীড়িতা মায়ের বন্দনা-গীতি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন যা রচনা। সমস্বরে প্রতি সকাল সন্ধ্যায় ভাইবোনে একত্রে বলো—'বন্দেমাতরম্'—আমি কান পেতে থাক্‌বো শুনবার জন্য।

সমাপ্ত